বিজ্ঞানের টুকি-টাকি

▣ রুপম দেবনাথ

ক্যানসারে 'ব্রেক' কষে নোবেল জেমস অ্যালিসন এবং তাসুকু হঞ্জোর

ক্যানসারের মুখে শরীর যেন ব্রেক-ফেল করা গাড়ি। কী ভাবে তার ব্রেক কষা যায়, তারই উপায় বাতলে দিয়ে এ বছর চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন প্রবীণ দুই বিজ্ঞানী। আমেরিকার জেমস অ্যালিসন এবং জাপানের তাসুকু হঞ্জো। তাঁদের গবেষণার বিষয় খানিক এ রকম– মানুষের শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। শরীরে বাসা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে সেই ইমিউনো সিস্টেমটাকেই সবার আগে আক্রমণ করে ক্যানসার। এই হামলা কীভাবে আটকানো যায়, তার সন্ধান দিয়েছেন ওঁরা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায়, 'ইমিউনো চেকপয়েন্ট থিয়োরি'। নোবেল কমিটির কথায়, "ক্যানসার প্রতিরোধে যে গতানুগতিক চিকিৎসা পদ্ধতির কথা আমরা জানি, সেই ভাবনাটাকেই বদলে দিয়েছে দুই বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত তত্ত্ব।" ক্যানসারের চেনা পরিচিত চিকিৎসা বলতে, অস্ত্রোপচার, রেডিয়েশন এবং কেমোথেরাপি। বলাই যায়, ৭০ বছর বয়সি অ্যালিসন এবং ৭৬ এর হঞ্জোর হাত ধরে এ বার ওই তিন পদ্ধতির সঙ্গে জোরদার ভাবে যুক্ত হতে চলেছে আর এক চিকিৎসা পদ্ধতি – 'ইমিউনোথেরাপি'।

অর্ধশতাব্দী পর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল মহিলার, সঙ্গী আরও দুই

সায়েন্স ফিকশনের গল্পকে বাস্তবায়িত করেছেন তিন বিজ্ঞানী। এ বার শুধু আলো ফেলেই নড়ানো-চরানো যাবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা ও কণিকাকে ! লেসার রশ্মির 'আঙুল' দিয়ে এ বার ধরা যাবে খুব ছোট ছোট কণা, পরমাণু, ভাইরাস আর জীবন্ত কোষকে। তাদের নড়ানো, চরানো যাবে। অবাক করে দেওয়া সেই উপায় বাতলিয়ে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় পর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন এক মহিলা। কানাডার ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড। পুরস্কার ভাগ করে নিলেন আরও দু'জন- আমেরিকার আর্থার অ্যাশকিন ও ফ্রান্সের জেরার্ড মুরোর সঙ্গে। লেসার রশ্মির 'দুই আঙুল' (টুইজার)-এর জাদুর খেলা দেখানোর জন্য ২০১৮ সালে পদার্থবিজ্ঞানে এই তিন জনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। 'দ্য রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস'-এর তরফে তিন পুরস্কারজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। গবেষণাগারে এতদিন ইলেকট্রনের মতো খুব ছোট ছোট কণা, পরমাণু আর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস বা জীবন্ত কোষগুলিকে জাপটে ধরার কাজটা ছিল খুবই দুরূহ। কারণ, ধরার মতো জুৎসই 'আঙুল' ছিল না। এ বার চুলের কাঁটার

মতো লেসার রশ্মির 'আঙুল' দিয়ে সেই খুব ছোট ছোট কণা আর ভাইরাসদের জাপটে ধরা যাবে। তাদের উপর লেসার রশ্মির মতো বিশেষ ধরনের আলো ফেলে আমাদের ইচ্ছা মতো তাদের নড়ানো, চরানো যাবে। ছোটানো যাবে কাঙ্খিত গতিবেগে বা প্রয়োজনে তাদের থামানো যাবে। ঠিক যেন সেই সায়েন্স ফিকশনের গল্প ! নোবেল পুরস্কারের ১১৭ বছরের ইতিহাসে পদার্থবিজ্ঞানে এই নিয়ে তিন জন মহিলাকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। এর আগে যে দুই মহিলা এই সম্মান পেয়েছেন, নাগরিকত্বের দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন পোলিশ। ১৯০৩-এ পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পান মারি ক্যুরি আর ১৯৬৩-তে পান মারিয়া গেপার্ট মেয়ার।

এবার বিবর্তনেও মানুষের নিয়ন্ত্রণ ! রসায়নের নোবেলে তারই ইঙ্গিত

রসায়নে তিন নোবেলজয়ী। ফ্রাঁসে এইচ আর্নল্ড, জর্জ পি স্মিথ ও স্যার গ্রেগরি পি উইন্টার। প্রকৃতির কাছ থেকে বিবর্তনের পাঠ নিয়ে প্রকৃতিকেই নিয়ন্ত্রণ ! যার নিয়ম প্রকৃতির আগে জানা ছিল না ! আমাদেরও বিস্তর ঘাম ঝরিয়ে খুঁজে নিতে হল। নোবেল পুরস্কারের ১১৭ বছরের ইতিহাসে ফ্রাঁসেই চতুর্থ মহিলা, যিনি রসায়নে তাঁর গবেষণার এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেন। এর আগে রসায়নে নোবেলজয়ী মহিলাদের অন্যতম মারি ক্যুরি (১৯১১), তাঁর মেয়ে আইরিন ক্যুরি (১৯৪৭) এবং ডরোকি ক্রাউফুট হজকিন (১৯৬৪)। প্রাকৃতিক বিবর্তনের পাঠ নিয়েই তা দিয়ে আমাদের জীবনকে আরও সহজে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছেন নোবেলজয়ীরা। যেটা প্রকৃতি ও পরিবেশ বলে দেয়নি। যার ব্যবস্থা প্রকৃতি করে রাখেনি। ৩৭০ কোটি বছর আগে প্রথম প্রাণের জন্মের পর থেকে মাটি, মরুভূমি আর সমুদ্রগর্ভে যাবতীয় জীবের জন্ম ও বিকাশের এক ও একমাত্র চালিকাশক্তির নাম- বিবর্তন। যার নিয়মকানুন প্রকৃতি ও পরিবেশই ঠিক করে দিয়েছে। সেই পথ কোথায় গিয়ে কতটা বাঁকবে, প্রকৃতি, পরিবেশই তা ঠিক করে রেখেছে। প্রাণকে টিকে থাকতে হলে প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হবে। সেই হাতিয়ারও জীবের শরীরে দিয়ে রেখেছে প্রকৃতি। যেন বলতে চেয়েছে, অস্ত্রটস্ত্র সবই থাকল হাতে। এ বার সেগুলিকে চালাতে শেখো। যুদ্ধ করতে শেখো। লড়। লড়াইয়ে জিতলে টিঁকে থাকবে। না পারলে হারিয়ে যাবে। এটাই বিবর্তনের মূল মন্ত্র। শুধু তাই নয় জীবনকে টিঁকে থাকতে আর এগিয়ে যেতে গেলে যে সব জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তার কাজগুলিও সেরে রেখেছে প্রকৃতি। বাঁচার রসদ সব জীবই তার পরিবেশ থেকে পেয়ে যায়। তাকে শুধু বেছে নিতে হয়। মেরুর সাগরেও মাছ পাওয়া যায়। জমজমাট বরফের হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় প্রাণের টিঁকে থাকার কথা ছিল না। তার তো জমে যাওয়ারই কথা। কিন্তু মেরুর সাগরে

মাছদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রকৃতিই তাদের শরীরে পুরে দিয়েছে বিশেষ এক ধরনের প্রোটিন। যাতে তারা বরফের রাজ্যে থাকলেও জমে হিম না হয়ে যায় ! ফ্রাঁসে কাজ করেছেন এনজাইম বা উৎসেচকের ওপর। যা আদতে প্রোটিন। কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে বা তার গতি শ্লথ করতে সাহায্য করে। এদের বলা হয় অণুঘটক (ক্যাটালিস্ট)। ফ্রাঁসে ওই এনজাইমকে তাঁর ইচ্ছা মতো চালিয়েছেন। যাতে তারা কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে নতুন নতুন প্রোটিন তৈরি করতে পারে। যারা অণুঘটক হিসেবেই ওষুধ বানাতে ও অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনের সহায়ক হবে। ফলে, ওই কাজগুলি অনেক সহজ ও সস্তা হয়ে যাবে। উৎপাদন প্রক্রিয়া অনেক বেশি দ্রুত হবে। বাকিটা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে যে দু'জনকে, সেই স্মিথ ও উইন্টার কাজ করেছেন 'ব্যাকটেরিওফাজ' নিয়ে। যা আদতে একটি ভাইরাস। আর তা ব্যাকটেরিয়ার শরীরে সংক্রমণ ঘটায়। তাঁদের উদ্ভাবিত পদ্ধতির নাম- 'ফাজে ডিসপ্লে'। যার মাধ্যমে নতুন নতুন চমকদার ওষুধ বানাতে আমাদের শরীরের অ্যান্টিবডিগুলিকে নিজেদের ইচ্ছা মতো চালাতে পারব আমরা। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাদের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। যেমনটা চাইছি, তাকে সেই ভাবেই কাজ করাতে পারব। তারাও হবে নতুন নতুন প্রোটিন। যা জটিল রোগের চিকিৎসায় লাগবে। এই পদ্ধতিতে ইতিমধ্যেই জন্ম নিয়েছে একটি জৈব যৌগ। আদালিমুমাব যা রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস ও সোরিয়াসিস (Adalimumab Rheumatoid Arthritis and Psoriasis) সারাতে খুব কাজে লাগে। কাজে লাগে সংক্রামক বাওয়েন ডিজিজ সারাতেও। যা শরীরে বিষের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করবে। হাতিয়ার হবে মেটাস্ট্যাটিক ক্যানসার চিকিৎসাতেও।

ফাইভ জি এলে কী কী সুবিধা হবে জানেন ?

নেট দুনিয়া জেট গতিতে ছুটছে। টু জি, থ্রি জি পর ফোর জি এসেছে। এ বার ফাইভ জি আনার পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফাইভ জি এলে নেট দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটে যাবে। ফোর জি-র থেকে একশো গুণ স্পিড বেশি হবে ফাইভ জি-র। এই কানেক্টিভিটির দৌলতে 'বাফারিং' শব্দটাই হয়তো মুছে যাবে ! চোখের পলকে এইচডি মুভি ডাইনলোড করা যাবে। দূষণহীন নেটওয়ার্ক হবে ফাইভ জি। ফোর জি-র তুলনায় এই নেটওয়ার্ক কম পাওয়ার কনজিউম করে। ফলে ফোনের ব্যাটারির আয়ু বাড়বে। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন আসবে। ফাইভ জি নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোনও জায়গায় যে কোনও সময় চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যাবে। দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে অস্ত্রোপচারের মতো বিষয়। ফাইভ জি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে নিমেষেই ড্রোনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসা পরিষেবা

পৌঁছে দেওয়া যাবে। শহরে দূষণের হালহকিকত স্মার্টফোনে এক ক্লিকেই পাওয়া সম্ভব হবে। দুর্গম জায়গা, প্রত্যন্ত অঞ্চল এমনকি খনির নীচেও কর্মীরা নির্ঝঞ্ঝাটে গোটা দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন এই ফাইভ জি নেটওয়ার্ক এলে। ফাইভ জি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে রিমোট পরিচালিত যানবাহন ও মেশিনকেও নির্ঝঞ্ঝাটে চালানো সম্ভব হবে। টু জি, থ্রি জি ও ফোর জি-তে যেটা অকল্পনীয়, ফাইভ জি-তে অনায়াসে তা সম্ভব।

খোঁজ মিলল পৃথিবীর মতো আরও দ্বিগুণ আয়তনের গ্রহের, মিলবে কি প্রাণের সন্ধান

প্রাণের খোঁজে এবার নজরে এল পৃথিবীর মতো এক গ্রহের। তবে, তার আয়তন পৃথিবীর থেকে দ্বিগুণ। এই গ্রহটির খোঁজ মিলেছে আলাদা একটি স্টার সিস্টেমে। যার নাম ফোরটি এরিদানি (40 Eridani)। কল্পবিজ্ঞানের জনপ্রিয় গল্প স্টার-ট্রেকের অন্যতম চরিত্র স্পোরক-এর গ্রহ ভালকান এখানে অবস্থিত। ইউনিভার্সিটি অফ ফ্লোরিডার বো-মা এবং তাঁর কয়েকজন সহকারী, অ্যারিজোনা থেকে ১.৩ মিটার টেলিস্কোপ-এর সাহায্যে পৃথিবীর মতো এই গ্রহটিকে খুঁজে পান। এর ঘনত্ব পৃথিবীর তুলনায় ৮.৫ গুন বেশি। এই গ্রহটি তার সৌরবলয়ের মূল স্টারটি-কে ৪২ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। এই স্টারটি এইচডি ২৬৯৬৫ বা ফোরটি এরিদানি নামে পরিচিত। এই স্টারটির বয়স সূর্য-র মতো হলেও তা অনেকটাই ঠান্ডা এবং এর ঘনত্ব অনেক কম। ১৯৯১ সালে স্টার-ট্রেকের জন্মদাতা জেনি রোডেনবেরি লিখেছিলেন ফোরটি এরিদানি ভালকান গ্রহের মূল স্টার। এই সৌর স্টার বলয়ে তিনটি মূল স্টার রয়েছে। যার জন্য একে ট্রিপল স্টার সোলার সিস্টেম বলা হয়। প্রত্যেক স্টারেরই নিজস্ব কিছু গ্রহ রয়েছে। যারা শুধু নির্দিষ্ট একটি মূল স্টারকেই প্রদক্ষিণ করে। যেমন পৃথিবীর মতো দেখতে গ্রহটি ফোরটি এরিদানিকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী থেকে এই স্টার বলয়ের দূরত্বও খুব বেশি নয়। মাত্র ১৬ আলোকবর্ষ। ফলে পৃথিবী থেকেই খালি চোখে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে উজ্জ্বল এবং জ্বলজ্বলে ফোরটি এরিদানিকে। পৃথিবীর মতো দেখতে চিহ্নিত হওয়া গ্রহটির বায়ুমন্ডলে ঘন গ্যাসবীয় জিনিসের আস্তরণ দেখা গিয়েছে। তবে, গ্রহে প্রাণ আছে কি না তা এখনই বলা যাচ্ছে না। দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরিক্ষাতে সামনে আসতে পারে এই গ্রহ সম্পর্কিত আরও তথ্য।

সূর্যের আলো থেকে জ্বালানি তৈরি ! নতুন দিশার সন্ধান দিলেন বিজ্ঞানীরা

সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে জলের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে আলাদা করে মনুষ্য সৃষ্ট প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে সূর্যের শক্তিকে এক

নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। কৃত্রিম উপায়ে সালোকসংশ্লেষ করে শক্তি তৈরির প্রচেষ্টা চলছে। সাধারণ সালোকসংশ্লেষের চেয়ে এই পদ্ধতিতে অনেক বেশি সূর্যের আলো শোষণ করা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, স্বাভাবিক সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ততোধিক কার্যকরী নয়। কারণ এতে শক্তির উৎপাদন সেভাবে হয় না। মাত্র ১ অথবা ২ শতাংশ শক্তি উৎপাদিত করে তা জমাতে পারে। তবে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি সালোকসংশ্লেষে শক্তির উৎপাদন হবে অনেক বেশি। বেশ কিছু বছর কৃত্রিম সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সামনে এলেও তা পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদনে সেভাবে কাজে লাগেনি। তার অর্থ এই নয় যে তা নতুন করে বড় ক্ষেত্রে কাজে লাগবে না। এই প্রথম সৌরশক্তি ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে সালোকসংশ্লেষের প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়েছে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের একটি দল এই নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে। এখন দেখার কীভাবে এই পথে আগামী দিনে সাফল্য আসে।

বিশ্ব-উষ্ণায়ন পৃথিবী আগেও সয়েছে, মানুষ নয় তার জন্য দায়ী কে ছিল জানেন

পৃথিবীর তাপমাত্রা যে বাড়ছে তা নিয়ে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। বিজ্ঞানীরা বারবার বলেন, এর দায় মানুষেরই। তারা প্রকৃতিকে অতিব্যবহার করে আজকের এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক এক গবেষনায় জানা গিয়েছে আজকের দিনে যে হারে তাপমাত্রা বাড়ছে তার চেয়েও অনেক দ্রুত তাপমাত্রা বাড়িয়েছিল আরেকটি মহাজাগতিক ঘটনা। সাম্প্রতিক গবেষনায় জানা গেছে চিকসুলাব গ্রহাণু - যাকে ডাইনোসর প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ হিসেবে ধরা হয়, তার আঘাতে হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল পৃথিবীর তাপমাত্রা। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, ৬ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে এই গ্রহানুটি পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছিল। তাতে এক ধাক্কায় আমাদের গ্রহের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছিল ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর এই বর্ধিত তাপমাত্রা চলেছিল পরবর্তী প্রায় এক লক্ষ বছর ধরে ! বিজ্ঞানীরা জানেন যেভাবে চলছে তাতে সামনে বড় বিপদ অপেক্ষা করে আছে। দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ু, আবহাওয়া। এর ফল কী হতে পারে তা হাতড়ানোর জন্য ইতিহাস ঘাঁটছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু এতদিন এরকম কোনও ঘটনা পাওয়া যায়নি, যেখানে বর্তমান সময়ের মতো দ্রুত হারে বদলের সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমাদের গ্রহটিকে। সেদিক থেকে এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন ভূ ও আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলছেন হঠাৎ, চরম পরিবেশগত পরিবর্তন থেকে পৃথিবীর বুকে কি কি ঘটতে পারে সে সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য মিলতে পারে এ সংক্রান্ত গবেষণা থেকে। তবে চিকসুলাব আঘাতের পরবর্তী প্রভাব নিয়ে এখনও বিতর্ক রয়েছে। একাংশের বিজ্ঞানীরা মনে করেন গ্রহানুটির আঘাতের পর বায়ুমন্ডল জুড়ে ছাইয়ের কণা ভেসে

বেড়াত। তাতেই পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যালোককে অবরুদ্ধ হয়ে পৃথিবীকে ঠান্ডা হতে সাহায্য করেছিল। আরেক দলের মত, গ্রহাণুটির আঘাতে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মুক্তি পাওয়া কার্বন, এবং তার সঙ্গে দাবানলে আগুন থেকে মুক্ত হওয়া কার্বন পৃথিবীর তাপ বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। সেই আঘাত পরবর্তী তাপমাত্রার পরিবর্তনকে ভালভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলোরাডো বোল্ডার ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বিশদে গবেষণা চালিয়েছেন। এর জন্য তাঁদের হাতে ছিল তিউনিসিয়া একটি এলাকা থেকে পাওয়া, ভালভাবে সংরক্ষিত, বালির মাপের মাছের দাঁত, আঁশ এবং হাড়ের নমুনা। সেগুলি তারা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, নমুনাগুলির মধ্যে অক্সিজেন আইসোটোপ আছে। অর্থাৎ সেসময় তাপমাত্রা সংশ্লিষ্ট প্রাণীটির বেঁচে থাকার মতো ছিল। গবেষকরা ভূত্বকের বিভিন্ন স্তর থেকে চিকসুলাব গ্রহানু আঘাতের আগে থেকে আঘাতের অনেক পরের সময় পর্যন্ত নমুনা সংগ্রহ করেছেন। সেগুলি বিশ্লেষণ করে তাঁরা জানিয়েছেন, সম্ভবত আঘাতের পরই বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা প্রায় ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবং তা বজায় ছিল তার পরে প্রায় ১ লক্ষ বছর। তারপর আবার আগের তাপমাত্রা ফিরে পায় পৃথিবী। এই মান এবং স্থিতিকাল মিলে গেছে অন্য একটি গবেষণার সঙ্গেও। সেটি ছিল গ্রহানুটি আঘাতের পর কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের মাত্রা ও তার স্থিতিকাল নিয়ে।

DEBOJYOTI ACHARYA
Technical Officer
Dharmanagar, North Tripura
Mob : 9485001848
Email : d.acharya@srmbsteel.com
SRMB TMT
WINGRIP